Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চাঁদ সদাগরের লাঠি ও হজরত মুসার আষা

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাঈদ-উর-রহমান
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.3
Pages	৬১-৭০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চাঁদ সদাগরের লাঠি ও হজরত মুসার আষা

সাঈদ–উর রহমান

বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলে অভিহিত *মনসামঙ্গলের* কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ সদাগরের হাতে সব সময় একটি লাঠি থাকে। সেই লাঠিকে সাপের দেবী মনসার বড় ভয়! দেবীর ইচ্ছা যে, সদাগর তার পূজা করুক; কিন্তু লাঠির ভয়ে দেবী সদাগরের কাছে আসতে সাহস করে না। একবার নাগালে আসায়, চাঁদ লাঠির আঘাতে দেবীর কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সদাগর পূজা করতে বাধ্য হলেও তার হাতে লাঠি থাকা অবস্থায় পূজার ফুল গ্রহণ করার জন্য মর্তে অবতরণ করতে দেবী রাজী হননি। দেবীর আতংক বুঝতে পেরে চাঁদ লাঠি দূরে ফেলে দিলে দেবী পূজা গ্রহণ করেন ও আশীর্বাদ জানান।

বিভিন্ন কবির কাব্যে সদাগরের লাঠি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বরিশাল এলাকার কবি বিজয় গুপ্ত বলেছেন 'হেতাল বাড়ি।'

চান্দ বেটা দুরাচার অতি করে অহংকার
মোরে মন্দ বলিল বিস্তর।
ধরিয়া হেতাল বাড়ি ঘটগোট চুর করি
মোর নামে কাপে থরথর।[১]

হেতাল নাম উল্লেখ করেছেন চব্বিশ পরগনার বিপ্রদাস পিপিলাই, ও বর্ধমান জেলার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।

উড়িষ্যার কবি দ্বারিকদাস লিখেছেন 'হেন্তালের বাড়ি'। তিনি সাময়িকভাবে মেদিনীপুর জেলায় বাস করার কালে *মনসামঙ্গল* কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

চান্দ বাণ্যা বলে কি তারে ডরি।
দেখা পাল্যে প্রাণে ধরিয়া মারি।।
যত দুঃখ দিয়া আছয়ে মোরে।
হেন্তালের বাড়ি তাহার তরে।।[২]

'হেন্তালের নড়ি' উল্লেখ করেছেন ক্ষেমানন্দ দাস-ও। কিন্তু বীরভূম জেলার বিষ্ণু পাল লিখেছেন 'হেটালের নড়ি'।

হেটাল-নড়ি লইয়া চান্দো রামা ধাঅ।
দক্ষিণ সাগর ঘরে রাজা আসিয়া ডাড়াঅ।[৩]

কবি নারায়ণদেব (কিশোরগঞ্জ) ব্যবহার করেছেন 'হেমতাল বাড়ি'।

হেমতাল বাড়ি লইয়া কান্দের উপর
লড় পাড়িয়া আইসে চান্দো সদাগর।[৪]

মালদহ জেলার কবি তন্ত্রবিভূতি এবং সিলেটের কবি ষষ্ঠীবর-ও লিখেছেন হেমতাল। কিন্তু বগুড়া জেলার অধিবাসী জীবনমৈত্র রচিত কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে 'হেমতার'।

কানীর কারণে আছে এহি হেমতার
লাগ পাইলে কানীর সুধিব এই ধার।[৫]

সুতরাং চাঁদ সদাগরের হাতে একটি দণ্ড পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র। সেটার নাম বিভিন্ন– হেন্তাল, হেতাল, হেঁতাল, হেটাল, হেমতাল ও হেমতার।

বিপ্রদাস পিপিলাইর *মনসা বিজয়* কাব্য সম্পাদনার সময় ডঃ সুকুমার সেন 'হেমতাল' শব্দটিকেই গ্রহণ করেছেন; যদিও স্বয়ং কবি ব্যবহার করেছিলেন হেতাল। ডঃ সেন মনে করেন যে, শব্দটির সঙ্গে হেতাল গাছের কোন সম্পর্ক নেই। এটি এসেছে নাগ-অধিপতি অনন্তের (শেষ) প্রতীক হৈম তালধ্বজ থেকে। নাগ-অধিপতির প্রতীক বলে সব নাগই একে মান্য করতে বাধ্য। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থেও তিনি সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৬] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'হেতাল' শব্দটি গ্রহণ করেছেন এবং সংস্কৃত হিন্তাল শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে করেছেন।[৭] অধিকাংশ অভিধানকারও সেভাবে ব্যাখ্যা করেন।

বাংলা ভাষায় 'হেতালবেদনা' বলে একটি শব্দ আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এর অর্থ করেছেন এরূপ—'ফুল পড়িবার পর জরায়ুর সঙ্কোচনকালে জরায়ু মধ্যস্থ জমাট রক্ত প্রভৃতি বাহির করিয়া দিবার উপায় স্বরূপ মুহূর্মুহু বেদনা।' এই যদি হয়, তাহলে সাপ–মনসা_হেতাল–হেতালবেদনা সবগুলো মিলিয়ে দেখলে সাপের সঙ্গে প্রজনন শক্তির যে সম্পর্ক চিন্তা করা হয়, তা-ও সমর্থিত হয়। যাই হোক, আমাদের বর্তমান আলোচনায় সেটা প্রাসঙ্গিক নয়।

চাঁদ সদাগরের লাঠি হেমতালের বা হেতালের হতে পারে। এটা কোন সাধারণ লাঠি নয়--এর সঙ্গে একটি রহস্য জড়িয়ে আছে। সাপ এবং সাপের দেবী উভয়ই একে ভয় করে বা মান্য করে।

সদাগর সে-লাঠি পেলেন কোথায়--এই প্রশ্ন সংগতভাবেই উঠবে। এটা কি বাঙালী কবির নিজস্ব ভাবনা থেকে এসেছে, না অন্য

কোন প্রভাবে এসেছে--তার উত্তর খোঁজা নিরর্থক নয়। যে-তথ্য আমাদের হাতে আছে, তার ভিত্তিতে বর্তমান পর্যায়ে এর সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে বাধা কোথায়?

দুই

ইসলামী উপাখ্যানে কয়েকজন নবীর হাতে একটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লাঠি মাঝে মাঝে দেখা যায়। এর আরবী নাম 'আষা'। মিসর দেশের ইসরাইল সম্প্রদায়ের নবী হজরত মুসার আষার কাহিনী সুপ্রচলিত। কোরান শরীফের অন্তত তিনটি সুরায় আষা-র মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মুহম্মদ হাবীবুর রহমান বিরচিত '*কোরানসূত্র*'[৮] থেকে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়ঃ

১। 'তারপর মুসা তার লাঠি ছুঁড়ে ফেলল আর সাথে সাথে সেটি এক সাক্ষাৎ অজগর সাপ হয়ে গেল।' (সুরা আরাফ, বাক্য-১০৮)

২। 'তারপর মুসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, ''তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে বাড়ি মার।" তখন তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মত হয়ে গেল। আর অপর দলটিকে আমি সেখানে পৌঁছে দিলাম, আর মুসা ও তার সঙ্গীদের আমি উদ্ধার করলাম।' (সুরা শোয়ারা, বাক্য ৬৭-৬৮)

কোরানের এই কাঠামো ঠিক রেখে সতের শতকের বিখ্যাত আলেম পীর ও কবি সৈয়দ সুলতান কাহিনীকে একটু সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁর রচিত '*নবীবংশ* কাব্যে নিম্নরূপ কাহিনী পাওয়া যায়ঃ

প্রথম মানব হজরত আদমকে আল্লাহ স্বর্গে বাস করার সময় চারটি জিনিষ দিয়েছিলেন--সেগুলোর অন্যতম ছিল বেহেশতের

বৃক্ষের ডাল দিয়ে তৈরি একটি লাঠি বা আষা। আদম-পত্নী বিবি হাওয়ার বন্ধু ছিল একটি ময়ূর ও একটি সাপিনী। সাপিনী স্বর্গের বহির্দেশ থেকে উদরে করে শয়তানকে বেহেশতে নিয়ে এসেছিল। শয়তানকে উদরে স্থান দেয়ার কারণে তখন থেকে সাপের বিষ জন্মায়। শয়তানের কুপরামর্শে আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে তাঁর হাত থেকে 'আষা' খসে পড়ে। পরবর্তীকালে আরো দুই পয়গম্বর হয়ে সেটা পৌঁছায় হযরত মুসার কাছে। মুসা আষা দিয়ে অজগর সংহার করেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় সেটা সর্পরূপ ধারণ করে ফেরাউনের সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছে; এবং শেষপর্যন্ত আষার সাহায্যেই মুসা নবী নীল নদকে দুই ভাগ করে ইসরাইল সম্প্রদায়কে নিরাপদে অপর পাড়ে নিয়ে গেছেন। নীল নদের তীরে দণ্ডায়মান মুসার প্রতি জিবরাইলের পরামর্শ:

জিব্রাইল পাঠাইলা মুসার যে পাশ
সাক্ষাতে আসিয়া কহে বহুল আশোয়াস।
মারহ 'আষার' বারি এহি সাগরেরে
বোল পন্থ করি দিতে তুহ্মি যাইবারে।
তা শুনিয়া আষা হাতে লৈলা পয়গম্বরে
মারিলা আষার বারি সেই সাগরেরে।
সাগরে চিক্কার ছাড়ি কান্দিতে লাগিলা।
অতি উষ্ণস্বরে ডাক বহুল ছাড়িলা।।
পুনি মুসা পয়গম্বরে আষা হাতে করি
মারিলেক সাগররে সে আষার বারি।[৯]

মিসর-প্রবাসী কেনান দেশের আরেক নবী হজরত ইউসুফ-ও আল্লার কাছ থেকে একটি 'আষা' পেয়েছিলেন বলে কবি শাহ মুহম্মদ

সগীর *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

নির্মল স্বরূপ আষা বিধির নির্মিত
হেন আষা ইছুফক দিলেন্ত বিদিত।[১০]

অবশ্য এই স্বর্গীয় লাঠি–র কোন ব্যবহার কাব্যের কোন অংশে দেখা যায়নি।

তিন

মুসার আষা এবং চাঁদ সদাগরের লাঠির মধ্যে কোন যোগসূত্র না থাকাই আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হয়। কোথায় বাংলাদেশ, আর কোথায় বা মিসর? চাঁদ সদাগরের কাহিনী পাঁচশ বছরের পুরানো, আর মুসা মর্তে এসেছিলেন কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। সেজন্য মনে হয়, এদের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান না করাই উচিত।

কিন্তু আবার যখন মনে হয় যে, পৃথিবীর কোন ধর্ম বা সভ্যতাই অবিমিশ্র নয়, তখন অসম্ভব কল্পনা করতে ইচ্ছা হয়। পৃথিবীর প্রধান সব ধর্ম এশিয়াতে জন্ম নিয়েছে; এবং একটির দ্বারা অপরটি পুষ্ট হয়েছে। মুসার জীবনকালের আগে ও পরে সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব–সংঘাত–সমন্বয় চলছিল। প্রাচীন কেনান জাতির মধ্যে অনেক নবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেনান জাতির একটি অংশ ফোনেশীয়রা বর্তমান লেবানন, ইসরাইল ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে গড়ে তুলেছিল বিরাট ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। তারা বাণিজ্য ব্যপদেশে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে পণ্যের আদান–প্রদান যেমন করেছিল, তেমনিভাবে একস্থানের ধর্মকে অপরদেশে নিয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পনের শতকে উত্তর সিরিয়ায় মিতান্নি (Mitanni) নামক

রাজ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর রাজারা রাজত্ব করত। পরবর্তী কালে হিট্টাইট বংশীয় রাজাদের কাছে তারা পরাস্ত হয়ে বিভিন্ন দেশে গমন করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ সালে হিট্টাইট ও মিতান্নির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিল ঋক্‌বেদীয় দেবতা মিত্র, বরুণ ও ইন্দ্র, মেসোপটেমীয় দেবতা Anu এবং এনলিল; এবং হিট্টাইটদের ঝড়ের দেবতা তেশুব (Teshub) এবং সূর্যদেবতা শিমেগী (shimegi)। এ সব তথ্যের আলোকে *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায়* বলা হয়েছে- As might be expected, the late Bronze Age presents a complex religious picture; a great many local cults were scattered through out syria-palestine, and the possibility for transmission and borrowing from one area to another were practically unlimited.[১১] ইন্দো-ইউরোপীয়ার এক শাখাই ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করে।

এই সীমাহীন সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করা যায়: সর্পপূজার উদ্ভব, মনসামঙ্গল কাব্য রচনা ও হেতাল গাছের প্রসঙ্গ।

চাঁদ সদাগরের কাহিনী সর্পপূজার সঙ্গে জড়িত। সাপের দেবী মনসার পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচারের উদগ্র বাসনা থেকেই সদাগরের সঙ্গে তার বিবাদ বেঁধেছিল চাঁদের লাঠ্যাঘাতে দেবীর কাঁকাল ভেঙে গিয়েছিল। মুসার কাহিনীতে সর্পপূজা নেই, কিন্তু সাপের উল্লেখ আছে। তিনি 'আষা'র আঘাতে নীলনদকে যে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, তারও একটি প্রতীকী তাৎপর্য দেখা যায়। মিসরীয় পুরাণ

কাহিনীতে নীলনদী ও দেবী অসিরিস সমার্থক। বলা যায়, মুসা ভেঙেছিলেন দেবী অসিরিসকে, যেমন করে সদাগর ভেঙেছিলেন আরেক দেবীকে।

প্রাচীন মিসরেও সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। সর্পাকৃতির অসংখ্য দেবীর পূজার্চনা সেদেশে প্রচলিত ছিল--এমনকি দেবীর চিত্রলিপি (hieroglyph) হিসেবে তৎকালে সর্পাকৃতি ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে।[১২] একদল পণ্ডিতের ধারণা যে, খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দে মিসরে প্রথম সর্পপূজার উদ্ভব ঘটেছিল এবং ফোনেশীয় বণিকেরা সেটা ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিল।[১৩]

মধ্যযুগের বাংলায় মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হবার পটভূমি হিসেবে হুমায়ুন কবীর ইসলামের প্রভাবকে নির্দেশ করেছেন। পূর্ব বাংলার বৈরী পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার প্রতীকী ভাষ্য চাঁদ সদাগর ও বেহুলা--দুজনেই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রাম করেছে। শিবের প্রতি সদাগরের অচলা ভক্তি ইসলামের একেশ্বরবাদেরই প্রভাবে এসেছে। তাছাড়া মনসামঙ্গলের কাঠামো, মুসলমানী চরিত্রের ব্যবহার, রচনাকাল বিশ্লেষণ করলে নতুন প্রচারিত ইসলাম ধর্মের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়।[১৪]

সবশেষে আসে হেতাল গাছের প্রসঙ্গ। পাম জাতীয় এই বৃক্ষটি সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত মাটিতে কেবল জন্মায়। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী সুন্দরবন, শ্রীলংকা, বার্মা, মালয় ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এর প্রাচুর্য রয়েছে।[১৫] পৃথিবীতে প্রায় ২৩৫ জাতের পাম গাছ পাওয়া যায় তার অন্যতম হল phoenix বা খর্জুর প্রজাতি। ফনিক্স জাতীয় গাছ প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার আমলে ছিল, প্রাচীন আসিরিয় সভ্যতার ভগ্নাবশেষেও এর নির্দশন রয়েছে।

বাইবেলেও খেজুরের উল্লেখ আছে।[১৬] অনুমিত হয় যে, সেসব এলাকা থেকেই খেজুর গাছের বীজ বা চারা বণিকদের দ্বারা বা সমুদ্রের জল বাহিত হয়ে উল্লেখিত সমুদ্র উপকূলে বংশবৃদ্ধি করেছে। phoenix জাতের প্রকারভেদ হল phoenix paludosa বা আমাদের হেতাল গাছ। সাধারণত ৮ থেকে ২৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, কাণ্ডের মাপ হয় ১ থেকে ১ $\frac{১}{২}$ ফুট ব্যাস। চৈত্র থেকে আষাঢ় মাসে এতে ফুল ও ফল হয়। পাকা ফলের রং হয় গাঢ় কাল বর্ণের--তবে খাওয়া যায় না। সাপ এই গাছকে ভয় পায় বলে জনশ্রুতি আছে। দুগ্ধবতী গাভীকে এই গাছে বেঁধে রাখলে সাপ গাভীর দুগ্ধপান করতে আসে না বলে সুন্দরবন এলাকার একজন চাষী আমাকে বলেছিলেন।

চাঁদ সদাগর এই হেন্তাল গাছের কাণ্ড থেকে তাঁর বিখ্যাত লাঠি বানিয়েছিলেন। হজরত মুসা তাঁর 'আষা' খেজুরের কাণ্ড থেকে বানিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে সেটা হওয়াই সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রীজয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৬২), পৃ ১৫১

২ শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৭৯), পৃ ৩৮

৩ সুকুমার সেন সম্পাদিত (এশিয়াটিক সোসাইটি: কলিকাতা, ১৯৬৮), পৃ ৫৬

৪ শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৪২), পৃ ১০০

৫ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৬২), পৃ ৮৮

৬ প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ ২০৪

৭ *বাইশা*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪৫

৮ ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

৯ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *রসুল চরিত*' (বাংলা একাডেমী: ঢাকা : ১৯৭৮), পৃ ৬১১

১০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৮৪), পৃ ৫৯

১১ সপ্তদশতম খণ্ড, *MACROPAEDIA*, পৃ ৯৬৭

১২ *The Mythology of All Races*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ১৬৬

১৩ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, একাদশ খণ্ড, পৃ ৪০০

১৪ সাঈদ-উর রহমান, *মনসামঙ্গল কাব্য ও ইসলাম ধর্ম*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৫, ২২ তম সংখ্যা

১৫ Naskar, Guha, Bakshi, Mangrove Swamps of the Sunderbans (কলিকাতা: ১৯৮৭), পৃ ৮৭

১৬ James C McCurrach, palms of the world'(নিউ ইয়র্ক, ১৯৬০)